শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১০)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেনারস

৬/৬/৪৫

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রখানা পাইয়াছি। আপনাকে একখানা দীর্ঘপত্র লিখি মনে করিয়া আজ বসিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি একখানা পত্রে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলা সম্ভবপর হইবে না। ধারাবাহিক কয়েকখানা পত্র লিখিতে হইবে। আপনি যদি ধৈর্য্য ধরিয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি যথা শক্তি লিখিতে চেষ্টা করিব।

আসল কথা - ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল। কারণ সবই রহস্যে আচ্ছন্ন। রহস্য ভেদ করিতে না পারিলে কিছুই বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গুরুবাক্যই রহস্য ভেদের একমাত্র উপায়। আমি 'জয়গুরু' বলিয়া পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপনিও 'জয়গুরু' স্মরণ করিয়াই পত্রখানা পড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

''কৃপাহীন যোগ'' — ইহাই আলোচনার মুখ্য বিষয়। এবার বাবা যে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা এই যোগপথে শিষ্য তৈয়ার করা। শিষ্য একই হইবে — কিন্তু একের মধ্যে অনন্তের সমাবেশ থাকিবে। আদি সৃষ্টি হইতে এখন পর্য্যন্ত এই পথ কার্য্যতঃ অপরিচিতই ছিল। কৃপাশূন্য যোগই যথার্থ গুরুর কর্ম। অনাদিকাল হইতে এখনও এ কর্ম উদ্‌যাপিত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য — কালের গতি রোধ করা ও সংসারের বা সর্বদুঃখের মূল উৎপাটন করা। ব্যক্তিগতভাবে মুক্তি, দুঃখ নিবৃত্তি, শান্তি, নির্বাণ, ঐশ্বর্য্য, পরমানন্দ প্রভৃতি প্রাপ্তির উপায় ছিল এবং এখনও আছে। অনেকে ঐসব অবস্থা আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে লাভও যে না করিয়াছেন এমন নহে। কিন্তু তথাপি সংসার যেমন দুঃখময় ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। কৃপাশূন্য যোগী ভিন্ন এই অখণ্ড দুঃখ মোচনের সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এ বিষয় অন্যান্য কথা পরে বলিব।

গুরু মরদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে ''বাবা'' বলিয়া ডাকিতাম তিনিও পিতৃভাবে আমাদিগের উপর যোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে অজস্র স্নেহ ও করুণা বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আসিয়াছিলেন কৃপাহীন কর্ম করিতে, কিন্তু কঠোর হইতে পারেন নাই — উপর হইতে কৃপাহীন হইবার জন্য তীব্র শাসন সত্ত্বেও কৃপা বিতরণই শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের একমাত্র ধ্যেয় ছিল। নরদেহে অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় কর্ম প্রাপ্ত হইয়া ঐ অবস্থাতেই উহাকে সম্পূর্ণ করিতে পারিলে এবং একটি ক্ষণের জন্যও কৃপার বশীভূত না হইলে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য পূর্ত্তির পক্ষে সম্পূর্ণ সাহায্য হইত। সাধারণ যোগীগণ অর্থাৎ কৃপাযুক্ত যোগীগণ ১০৮-এ স্থিতিলাভ করেন। ইহাই অনন্ত। ইহাকে ভেদ করিতে না পারিলে অনন্তের অন্ত হইয়া ১০৯-এ প্রবেশ অর্থাৎ একের মধ্যে অনন্তকে সমাবিষ্ট করা সম্ভবপর হয় না। গুরুদেব কৃপাযুক্ত ১০৮ ছিলেন। ইহাই অনন্তভাব। কিন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের অন্ত বা ৮-এর অন্ত হইয়া ১০৯-এ প্রবেশ হইয়াছে। এই জন্যই তিনি পুনর্বার আবির্ভূত হইতে পারিতেছেন। ১০৮-এ যে যোগীর অবসান হয় তাহার পক্ষে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হয় না।

গুরুদেব মরদেহে কর্ম পান নাই। তিনি শুদ্ধ দেহে কর্ম পেয়েছিলেন এবং শুদ্ধদেহে জ্ঞানের রাজ্যেই কর্ম সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতে ইহা হইয়াছিল। যখন লোকালয়ে নামিয়া আসেন তখন তাঁহার কোন কর্ম ছিল না, শুধু স্বভাবের কর্ম ছিল। এতদ্ব্যতীত, তিনি কৃপাশূন্য হইতে পারেন নাই। এইজন্য এই সকল ন্যূনতা পরিহার করিয়া এবার কৃপাশূন্য যোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। গুরু এখন পার্থিব দেহে নাই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন যে কোন ব্যক্তি ''নিমিত্ত'' রূপ আধার হইতে পারেন। কারণ তাঁহার দেহ গুরুদেহ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য কোনও শিষ্যের মধ্যে না থাকিবার দরুণ এবং এক প্রকার ব্রহ্মচর্য্য অপরিহার্য্য বলিয়া একটি শুদ্ধ আধার আবশ্যক যাহা অখণ্ড ব্রহ্মচারীর প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই প্রকার প্রতিনিধিও ''নিমিত্ত'' মাত্র। ইহার পারিভাষিক নাম ''আধা''। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে বলিব। এই ''আধা''তেই গুরুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত হয়। মরদেহ

সম্পন্ন ''আধা''কে এই প্রকার গুরুভার বহনের উপযোগী করিবার জন্য অতি কঠোর তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যে অন্ন ও জলের দ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্নময় কোষ এবং পরম্পরাতে অন্যান্য কোষ পুষ্টিলাভ করে তাহা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া ঐ ''আধা''র দেহ কোনও দিব্য ও অলৌকিক শক্তিদ্বারা সঞ্জীবিত রাখা হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্নজল ত্যাগ না করিলে লোকাত্তর তেজঃ ও ঐশ্বর্য্য ধারণ করা সম্ভবপর হয় না।

৭/৬/৪৫

পূর্ব্বে বলিয়াছি গুরুদেবের যে কোন দীক্ষা প্রাপ্ত শিষ্য, যিনি গুরুদত্ত বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আধার বা নিমিত্ত হইতে পারেন। কিন্তু ইহা শুধু স্বরূপ যোগ্যতার কথা। কারণ মহানিশার কর্মপ্রাপ্ত হইয়া এবং ঐ কর্ম সমাপ্ত করিয়া ১০৩ বা ভাবে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ফলতঃ তিনি আধার হইতে পারেন না। (কৃপাযুক্ত যোগপথ এবং কৃপাহীন যোগপথ উভয়-এই ১০৩ = ভাব । ভাবে প্রবেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বভাব বা প্রকৃতির স্রোত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ ১০০ তেই কর্মের অবসান। তরপর বোধ ও জ্ঞানের কর্ম থাকে - ১০২ পর্য্যন্ত। জীব না থাকিলেও জীবভাবের লেশটা থাকিয়া যায় বলিয়া ১০১-১০২-এর কর্ম বস্তুতঃ কর্মাভাস। কিন্তু ভাবে প্রবেশ করার পর তাহাও থাকে না। ভাবরাজ্যে কর্ত্তা নাই — ঐ রাজ্যটি কর্তৃত্ব অভিমানের অতীত অবস্থা। এইজন্য ঐ অবস্থায় কর্ম থাকে না — কর্মদাতা গুরুও একপ্রকার অব্যক্ত হইয়া যান। আদেশরূপে গুরুবাক্য আর আসে না, যাহা কর্মের প্রবর্তক হইতে পারে। প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে যে একমাত্র প্রকৃতিরূপিণী গুরুশক্তিই ঐ অবস্থায় কার্য্য করিয়া থাকে।

কৃপাযুক্ত মার্গে ১০৩-এ প্রবেশ হইলেই ভাবের উদয় হয়। তখন ভাবই নিয়ামক। পুরুষভাবের সম্যক্ নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া স্বয়ং প্রকৃতি স্বরূপে স্থিতি লাভ করাই ১০৭। ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ১০৭-এ গতি হয়। তারপর প্রকৃতির অতীত ১০৮ বা গুরু। ইহাই অনন্ত। এইখানে সংখ্যা পূর্ণ হয় বলিয়া ইহাই পূর্ণত্ব। ১০৯-এর রহস্য এখন থাক।

কিন্তু কৃপাহীন মার্গে ১০৩ হইতেই ১০৫ হয়। ১০৪ হইয়া উঠিতে হয় না। তদ্রূপ ১০৫ হইতেই ১০৯ হয়। ৬,৭,৮ ভেদ করিতে হয় না। ইহার রহস্য পরে বলিব।

সাধক ও যোগীর স্বরূপগত, কর্মগত ও লক্ষ্যগত ভেদ বোধ হয় কিছু কিছু অবগত আছেন। সাধারণ মনুষ্য হইতে সাধকের পার্থক্যও বোধ হয় কতকটা আপনার মনে আছে। এইজন্য ঐ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কথা এখানে বলিলাম না। তবে দুই একটি সূক্ষ্ম বিষয়ে যথা সম্ভব সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

একটি কথা মনে রাখিবেন। আমাদের এই মলিন স্থূলদেহ কর্ম করে না, করিতে পারে না। কর্ম করে শুদ্ধদেহ বা তাহার ছায়া। সাধারণ লোকের শুদ্ধদেহ নাই তাহাদের মধ্যে চৈতন্য অতি ঘন আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন থাকে। অর্থাৎ বাবার ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের মধ্যে পরমাণুর প্রকাশ থাকে না। জন্মকালীন উপাদান ও বিশ্ব শক্তির অবস্থাগত বৈশিষ্ট্যের উপর যোগী, সাধক ও সাধারণ লোকের স্বরূপগত ভেদ নির্ভর করে। যোগী ক্ষণে জন্মগ্রহণ করে ক্ষণকে না হইলেও তাহার আভাসকে প্রাপ্ত হয়। সাধারণ লোক উভয় হইতে বঞ্চিত। যখন যোগী দীক্ষাপ্রাপ্ত হয় তখন গুরু সর্ব্বপ্রথম তাহার অণুসকলকে অর্থাৎ ৪৯ টি অণুকে আকর্ষণ করেন, আকর্ষণ করিয়া নিজ কায়াকে মিলাইয়া নেন — পরমাণুটি অণুহীন হইয়া ক্ষণমাত্রের জন্য বর্তমান থাকে। শুধু পরমাণুটি থাকে, আর থাকে তার আশ্রয়রূপী মৃৎপিণ্ডটি বা ধরাটি অর্থাৎ physical coat-টি। ওটি শববৎ অবস্থান করে। তাহার পর গুরু স্বকায়া হইতে তদংশভূত শুদ্ধকায়া ঐ পরমাণুতে যোজনা করেন। ইহাই দ্বিতীয় জন্ম। তখন পরমাণু স্বকায়া বিশিষ্ট হইয়া চৈতন্যলাভ করে — পূর্ব্বোক্ত শববৎ অবস্থা তখন কাটিয়া যায়। এই স্বকায়াই শুদ্ধদেহ। বিশুদ্ধ চৈতন্যময় স্বরূপ, যাহা গুরু হইতে শিষ্য দীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হয়। ইহা শুদ্ধ তেজোময় আকার স্বরূপ। ইহারই নাম জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী। ইনি চৈতন্য স্বরূপ। ইহাকেই গুরুশক্তি বলে। যোগমার্গে দীক্ষিত শিষ্যের মধ্যে ইনিই কর্ম করিয়া থাকেন। নিরন্তর কর্ম করিতে করিতে ইনি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করেন। কর্ম পূর্ণ হইলেই ইঁহার পুষ্টিও পূর্ণ হয়। বস্তুতঃ ইনিই ইষ্ট। চরমে ইনিই স্বয়ং চিৎশক্তি মহামায়া-১০৭। যোগী স্বয়ং মহাজ্ঞান ভেদ করিয়া এই মহামায়ারূপা চিৎপ্রকৃতির সারূপ্য প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ স্বয়ংই প্রকৃতিরূপে পরিণত হন। তারপর ১০৮-এ প্রকৃতি লঙ্ঘনের অনন্তর পুরুষোত্তমে প্রবেশ হয়। ইহা কৃপাযুক্ত যোগ পথের কথা। সাধকের কিন্তু এরূপ হয় না। সাধক দীক্ষাকালে শুদ্ধদেহ পান না—তার ছায়াটা মাত্র পান। তা ছাড়া, গুরু সাধক দীক্ষা স্থলে অণু আকর্ষণ প্রভৃতি করেন না। সাধকের অণুগুলি সাধকেই থাকে। দীক্ষানন্তর সাধনার প্রভাবে ঐগুলি পরমাণুতে পরিণত হয়। এইভাবে অপুষ্ট পরমাণু পুষ্টিলাভ করে।

পক্ষান্তরে যে ছায়াময় শুদ্ধদেহ সাধক প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা শুদ্ধ কায়াতে পরিণত হয়। ইহাই প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ বা ১০৪। সাধকের ইহাই চৈতন্যাত্মক আত্মাস্বরূপে স্থিতি বা পরম প্রাপ্য। যোগী শিষ্য দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহা প্রাপ্ত হয় সাধক শিষ্য সাধনার পরিসমাপ্তিতে ঐ অবস্থাতে স্থিতিলাভ করে। বলা বাহুল্য, ১০৪-এ স্থির থাকার উপায় নাই। কারণ স্বভাবের স্রোত নিরন্তর ১০৮-এর দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং ১০৪-এ অবস্থিত সাধকও যোগী হইয়া আটের দিকে (১০৮-এর দিকে) গতিলাভ করে এবং ঐ গতি অনন্তেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু এই প্রকারে যোগী হওয়ার কোন মূল্য নাই — কারণ ইহা প্রাকৃতিক ব্যাপার মাত্র। সাধক স্মৃতিশূন্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার identity-র বোধ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবেন সাধক ও যোগীতে কত প্রভেদ। যোগীর কর্ম্মই স্বকর্ম — সাধকের স্বকর্ম নাই। সে যখন 'স্ব' কে প্রাপ্ত হয় তখন আর তাহার কর্ম করিবার অবসর থাকে না। তখন সে শুদ্ধ-চৈতন্য মাত্র, — স্মৃতিহীন চিহ্নহীন চিৎসত্তা মাত্র।

এই যে সাধক ও যোগীর তুলনা করিয়া কয়েকটি কথা বলা হইল তাহা কৃপাযুক্ত যোগী সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। কৃপাহীন যোগী জগতে এখনও হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে ঐ সকল কথা প্রযোজ্য নহে।

৮/৬/৪৫

আজ তাড়াতাড়ি আর কিছু লিখিতে পারিলাম না। আবার কাল লিখিব। এই পত্রগুলি আপনার নিজের কাছে রাখিবেন। কাহাকেও নকল করিতে দিবেন না। শচীনদাকে অবসর মত পড়িয়া শুনাইবেন।

বহু কথা লিখিবার আছে। ক্রমশঃ লিখিব। ধৈর্য্য হারাইবেন না। অমূল্য কবে আসিবে? বাড়ীর সংবাদ কি? পানুর সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণণের পত্র আশাপ্রদ। শ্রীশ্রীগুরুদেবের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

শোভামার পত্র পাইয়াছি। শরীর ততটা ভাল না বলিয়া লিখিয়াছেন। মাখন কলিকাতাতেই কার্য্য করিতেছে। এখানকার এক প্রকার কুশল। শীঘ্র উত্তর দিবেন। দিদিদের সংবাদ পরে লিখিব। ইতি—

স্নেহার্থী গোপীনাথ

(ঁশ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)

পূষা বা বালসূর্যের সঙ্গে অজ একপাদের সম্পর্কের কথা কোন কোন পণ্ডিত তুলেছেন। কীথ সাহেবের মতে পূষা অজ একপাদের মতই ছিলেন পরে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হন। আবার রেনো প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন - ইনি সূর্যের প্রতিনিধি। রুদ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতার সঙ্গে অজ একপাদকে মিলিয়ে যতই আলোচনার চেষ্টা হোক না কেন তিনি যে প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্যই এটা নিরুক্তের দৃষ্টি থেকে মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

....ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাত্মা কবীর

'কবীর' কথার অর্থ মহাত্মা। সন্ত্ কবীরের দর্শনে আমরা দেখি যোগ সমন্বয়ে প্রেম আর ভক্তির প্রকাশ। তাঁর সহজ সাধন পদ্ধতি মতে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার সব থেকে সহজ পথ হল ভক্তি। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও জীবের প্রতি দয়া থাকলে তবেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব। কবীর বলেন, ''ক্ষমারূপ ক্ষেত্রে ভালরূপে লাঙ্গল দিয়ে তাতে স্মরণরূপ বীজ বপণ করতে হয়। সবকিছু শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু ভক্তিরূপ বীজ কখনোই বিফল হয় না।''

একবার কবীর একটি কাপড় বুনে হাটে বিক্রী করতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ভিখারী এসে তার কাছে ভিক্ষা চাইতে তিনি কোন কিছু চিন্তা না করেই কাপড়টি তাকে দিয়ে দিলেন। সংসারের অভাব, মায়ের তিরস্কার কিছুই তখন তাঁর মনে পড়ল না। খালি হাতে তিনি তখন বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন যে বাড়িতে অনেক খাবারই মজুদ রয়েছে।মা কে জিজ্ঞাসা করায় তাঁর মা অবাক হয়ে বললেন যে কিছু আগে কবীর নিজেই এসে তো সব জিনিস রেখে গিয়েছিলেন।

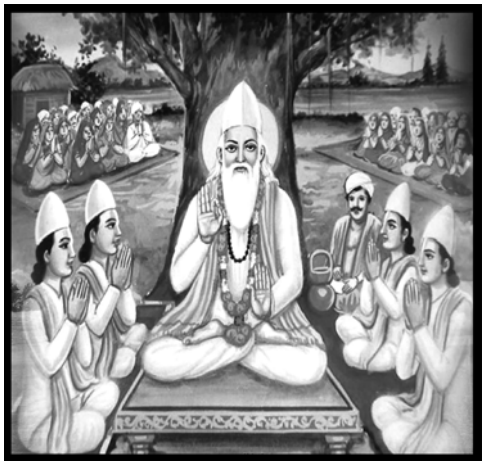

তখন কবীর বুঝতে পারলেন যে তাঁর বাড়িতে এসে কৃপা করেছেন স্বয়ং রামচন্দ্র, তিনি মনে মনে অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করলেন তাঁর ইষ্টদেবকে। ভক্তের অন্তরে থাকেন ভগবান। একমাত্র অন্তরে খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তখন জানা যায় যত নর-নারী যত জীব সবই তাঁরই রূপ মাত্র।

একদিন এক ভক্ত এসে কবীরদাসকে ঈশ্বর কোথায় আছেন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের অন্তরেই রয়েছেন।

তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ দোঁহাতেও তিনি বলেছেন—

''মোকোঁ কহাঁ ঢূঢ়ে বন্দে, মৈঁ তো তেরে পাসমেঁ
নামেঁ দেবল নামেঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাসমেঁ।
না তো কৌন ক্রিয়া-কর্মমেঁ, নঁহী যোগ-বৈরাগমেঁ
খোজী হোয় তো তুরন্ত মিলিহৌঁ, পল-ভরকী তালাসমেঁ।
কহেঁ কবীর সুনো ভাই সাধো, সব শ্বাসোঁকী শ্বাসমেঁ।।''

অর্থাৎ, ''আমায় তুই খুঁজে বেড়াচ্ছিস কোথায়— আমি তো তোর পাশেই রয়েছি। আমি মন্দির, মসজিদ, কাবা, কৈলাস কোথাও নেই। আমি নেই কোনো ক্রিয়া-কর্মেতে বা যোগ-বৈরাগ্যতে। সন্ধানী হোলে এক পলকের খোঁজাতেই আমাকে পেয়ে যাবি। কবীর বলছেন সাধু শোনো তিনি আছেন সব প্রাণের প্রাণে।''

যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় ভক্তদের কাছে বিভিন্ন তত্ত্বকথা আলোচনার সময় কবীরদাসের নানা দোঁহার উল্লেখ করতেন। শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীসত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্কলিত পুস্তক 'পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী' বইটিতে দেখা যায় শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন — *''জো কবিরা সূর্য্যকা রূপ সেই অবিনাশী ব্রহ্ম সোই হম''* — *যিনি আত্মসূর্য্যরূপী কবীর তিনিই অবিনাশী ব্রহ্ম, আবার তিনিই আমি।* তিনি অপর এক জায়গায় লিখেছিলেন যে সত্যযুগে কবীর সাহেবের নাম ছিল সত্যসুকৃত, ত্রেতা যুগে ছিল মুনীন্দ্র, দ্বাপর যুগে ছিল করুণাময় ও কলিযুগে ছিল কবীর। (***সহায়ক গ্রন্থ:*** *পরম ভাগবত মহাত্মা কবীর ও পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী*)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া